# সম্পাদকীয়

(https://bonikbarta.net/home/news_category/11/0)

চাকরির আবেদনে ভ্যাট

## এনবিআরের সহজ শিকার

আবু তাহের খান

সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৩ |

সরকারি চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন ফির অপারেটর-কমিশনের অংশের ওপর সম্প্রতি ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এটি আয়হীন অসহায় বেকারদের ওপর অনেকটাই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মতো। সরকারি চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে হারে ফি আদায় করা হচ্ছে, সেটাকেই সাধারণ মানুষ মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে করে। এ অবস্থায় এ ক্ষেত্রে নতুন করে ভ্যাট আরোপ নিঃসন্দেহে অন্যায় ও অন্যায্য এবং সে কারণে স্পষ্টতই এটি একটি রাষ্ট্রীয় অনাচার, তা পরিমাণে সেটি যত সামান্যই হোক না কেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ একটি অন্যায় ও অন্যায্য পদক্ষেপ তাহলে সরকার গ্রহণ করল কেন?

(https://electromart.com.bd)

চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন ফির ওপর ভ্যাট আরোপসংক্রান্ত সংবাদের সঙ্গে গণমাধ্যমে এর কারণ সম্পর্কেও খানিকটা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় এবং নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় সরকারকে বড় ধরনের রাজস্ব ঘাটতিতে পড়তে হয়েছে। এমতাবস্থায় চলতি অর্থবছরেও যাতে সে ধরনের রাজস্ব ঘাটতি সৃষ্টি না হয়, তার আগাম কৌশল হিসেবেই চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন ফির ওপর এ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যয় ক্রমাগতই কেন বাড়ছে, যার জন্য নানা ক্ষেত্রে নতুন করে ভ্যাট ও অন্যান্য কর বসাতে হচ্ছে? বাড়ছে এসব কারণে যে বাংলাদেশ বিমানের গত ১ সেপ্টেম্বরের ঢাকা-নারিতা ফ্লাইটে ৭১ বা তারও বেশিজনকে অতিথি করতে হয়েছে, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে একচেটিয়া মুনাফা লুটের সঙ্গে জড়িত স্বগোত্রীয় বণিকদের ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকার শুল্ক অব্যাহতি দিতে হয়েছে।হজের নামে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের শতাধিক জনের লাটবহরকে মাসাধিক কাল ধরে মক্কায় পুষতে হয়েছে এবং এরূপ আরো নানা গর্হিত কাজের পেছনে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।আর চরম দুর্ভাগ্য ও হতাশার বিষয় এই যে রাষ্ট্রের এ বিপুল রাজস্ব ঘাটতির সময়েও এ ধরনের অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারী ব্যয়ের তালিকা প্রতিদিনই আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এ অবস্থায় হাতের কাছে স্বগোত্রের বাইরে এবং প্রতিবাদে অক্ষম যাকেই পাওয়া যাবে, বাড়তি রাজস্ব আদায়ের জন্য সে-ই যে এনবিআরের সহজ শিকারে পরিণত হবে—এটাই স্বাভাবিক।বেকার চাকরিপ্রার্থীরা এখন সে হিসাব-নিকাশেরই বলি এবং এনবিআরের জন্য তারা এখন খুবই জুতসই গ্রাহক। কারণ এনবিআরের জাল থেকে কৌশলে বেরিয়ে যাওয়ার হাজারটা উপায় বিত্তবান ধূর্ত করদাতাদের জানা থাকলেও চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সে সুযোগ একটুও নেই। আর এ প্রসঙ্গে অন্য কয়েকটি নৈতিক প্রশ্নও সামনে চলে আসে।সরকারি দপ্তরগুলোতে জনবল নিয়োগসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীদের কাছ থেকে বিরাট অংকের ফি আদায় করা হচ্ছে কোন যুক্তিতে? যদি ধরেও নেয়া হয় যে ফি নিতেই হবে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এ পরিমাণ কি এতটা বেশি হওয়া উচিত? আর তা উচিত নয় বলেই এ ফি কমানোর জন্য চাকরিপ্রার্থীরা বহুদিন ধরেই দাবিদাওয়া জানিয়ে আসছিলেন।কিন্তু সে দাবিদাওয়া পূরণ তো দূরের কথা, উল্টো এখন তাদের ওপর ভ্যাট বসিয়ে দেয়া হলো।

অভিযোগ রয়েছে যে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে বড় অংকের ফি নেয়ার নেপথ্য কারণ হচ্ছে, আদায়কৃত ফি পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্মানী ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের নামে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন এবং সে অর্থ থেকে দেদারসে খানাপিনাও করেন। ফলে ফির পরিমাণ বাড়লে ভাগের পরিমাণও স্ফীত হয়। এর বাইরে এখন এনবিআরও হয়তো চিন্তা করবে, এ ফিয়ের হার ও পরিমাণ যত বাড়বে, তাদের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও ততই বাড়বে। কিন্তু জিজ্ঞাসা … য়মিত কাজের আওতায় পড়ে … হারাদি সম্পন্ন

(https://electromart.com.bd)

করার সুযোগ কোথায়? প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা, এ দেশের গরিব-দুঃখী সাধারণ মানুষ ও তাদের হতভাগা চাকরিপ্রার্থী বেকারদের আপনারা আর কতটা শোষণ করবেন? একবার ভেবে দেখুন তো, গত ৫২ বছরে চাকরিপ্রার্থী বেকারদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কত শত কোটি টাকা আদায় করে এর কর্মচারীরা চাকরি বিধিমালা ও আচরণবিধি ভঙ্গ করে সম্মানী ও ভোগ-বিলাসের নামে কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন?

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির আবেদন ফি থেকেও এখন লাখ লাখ টাকা আয় হয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা তা ভাগযোগ করে নেন।এ নিয়ে নানা কেলেঙ্কারির খবরও মাঝেমধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে।আর সেসব খবর থেকে এটাও জানা যাচ্ছে যে এ অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে একধরনের মহোৎসবও হয়ে থাকে! আর তা দেখে মনে হয়, তেল-চিনি-ডিমের সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পার্থক্য খুবই সামান্য।এনবিআর কি বিষয়টির খোঁজ রাখে? রাখলে তাদের কাছে একটি অনুরোধই করব, ওই অসহায় চাকরিপ্রার্থীদের ওপর চড়াও না হয়ে দয়া করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ বাবদ যে বিপুল অর্থ আয় করে, তার ওপর কর বসান।তাহলে দুপক্ষই লাভবান হবে।তবে একটি দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর প্রকৃত সমাধান হচ্ছে বেকারদের কাছ থেকে গৃহীত চাকরির আবেদনপত্রের সঙ্গে কোনো ফি-ই গ্রহণ না করা।আসলে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা তো রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।সে ক্ষেত্রে একজন বেকারের জন্য কাজের ব্যবস্থা না করে উল্টো তার ওপর ফি ও ভ্যাট আরোপ বস্তুতই সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল।বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (খ) অনুচ্ছেদ স্পষ্টতই সব নাগরিকের জন্য "কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার প্রদান করেছে।

কিন্তু উল্লিখিত সাংবিধানিক অধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রাষ্ট্র যখন বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে ও একই সঙ্গে তাদের উৎসবের আমেজে ভাসিয়ে রাখার জন্য নিম্নবিত্তের সাধারণ মানুষের ওপর হায়েনার মতো চেপে বসে, তখন সে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এরূপ একটি রাষ্ট্রের জন্যই কি আমরা চব্বিশ বছর ধরে সংগ্রাম ও একাত্তরের নয় মাসজুড়ে যুদ্ধ করেছিলাম? চাকরির আবেদন ফির ওপর আরোপিত ভ্যাটের ওই পরিমাণ হয়তো এমন আহামরি অংকের কিছু নয়।কিন্তু এর নৈতিক দিকটি দেখলে এতে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।এ প্রসঙ্গে তাই খুবই সরাসরি জিজ্ঞাসা, যাদের বিত্তের কল্যাণে ২৭৬৫ মার্কিন ডলার (পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৮ ডলার কম) মাথাপিছু আয়ের দম্ভ, তাদের কাছ থেকে কি এনবিআর কড়ায়-গণ্ডায় না হোক মোটামুটি হারে হলেও সবটুকু কর আদায় করছে বা করতে পারছে? না, তা তারা করছে না বা করতে পারছে না।মূল কারণ দুটি: এক. এতে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এবং দুই. রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ওই বিত্তবানদের করদানে বাধ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই।সে তুলনায় চাকরির আবেদন থেকে ভ্যাট আদায় করা অনেক বেশি সহজ ও ঝামেলাবিহীন।অথচ বিত্তবানদের ক

যেত, তাহলে চাকরির আবেদ

(https://electromart.com.bd)

সামনে নির্বাচন–এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চালাক-চতুর বিত্তবানরা এ সময়ে রাজস্ব ফাঁকির বাড়তি সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা যেমনি করবেন, তেমনি আবার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষও হয়তো গায়ে পড়ে তাদের কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়ার কথা ভুলবেন না (অতীতের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে)।আর এ দুয়ে মিলে সামনের নিকট সময়টুকু ধূর্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বেশ ভালো কাটবে বলেই মনে হচ্ছে।তবে মনে রাখা দরকার যে তাদের সময় যত ভালো কাটবে, চাকরিপ্রার্থীদের অনুরূপ সমশ্রেণীর নিম্নবিত্তের জীবন ততই কঠিন হয়ে পড়বে।কারণ বিত্তবানদের উপার্জন ও মুনাফার লালসা এ সময়ে এতটাই প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যে এসবের মূল্য জোগাতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে আরো বেশি হারে কর দিতে হবে, আরো বেশি মূল্যে সেবা ও জিনিসপত্র কিনতে হবে এবং সার্বিক জীবনযাত্রার জন্য আরো বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে।যদিও এ সময়ে তার আয় ও উপার্জন একটুও বাড়বে না।

মোট কথা, চাকরির আবেদনের ওপর ভ্যাট আরোপই নিম্নবিত্তের কষ্ট ও ভোগান্তির সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হয়ে থাকবে না।বরং এর সঙ্গে অনুরূপ এবং নতুন মাত্রার আরো নানা নতুন অনুষঙ্গ যোগ হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।আর এজন্য রাষ্ট্রের চরিত্রকেই হয়তো আমরা দায়ী করব।কিন্তু এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর দায়ও কি নেই? ১৯৬০-এর দশকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে প্রতিবাদী হওয়ার যে চারিত্রিক দৃঢ়তা আমরা দেখেছি, তার ছিটেফোঁটা কোনো অস্তিত্বও শেষোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে এখন টিকে আছে? বাঙালির প্রতিবাদী সত্তা কি তাহলে একেবারেই হারিয়ে গেল? না, এখনো হয়তো তা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মুমূর্ষুতা নিয়ে যেভাবে তা টিকে আছে, সেটিকে কি বাঁচা বলা যায়? চাকরির আবেদনের অপারেটর-কমিশনের অংশের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের ঘটনার নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়া সে মুমূর্ষুতাকেই কি নির্দেশ করছে না?

**আবু তাহের খান:** ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত;

সাবেক পরিচালক, বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়

# সম্পাদকীয়

সময়ের ভাবনা

(https://electromart.com.bd)

নিম্নবিত্ত ও

ড. মিহির কুমার রায়

সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৩

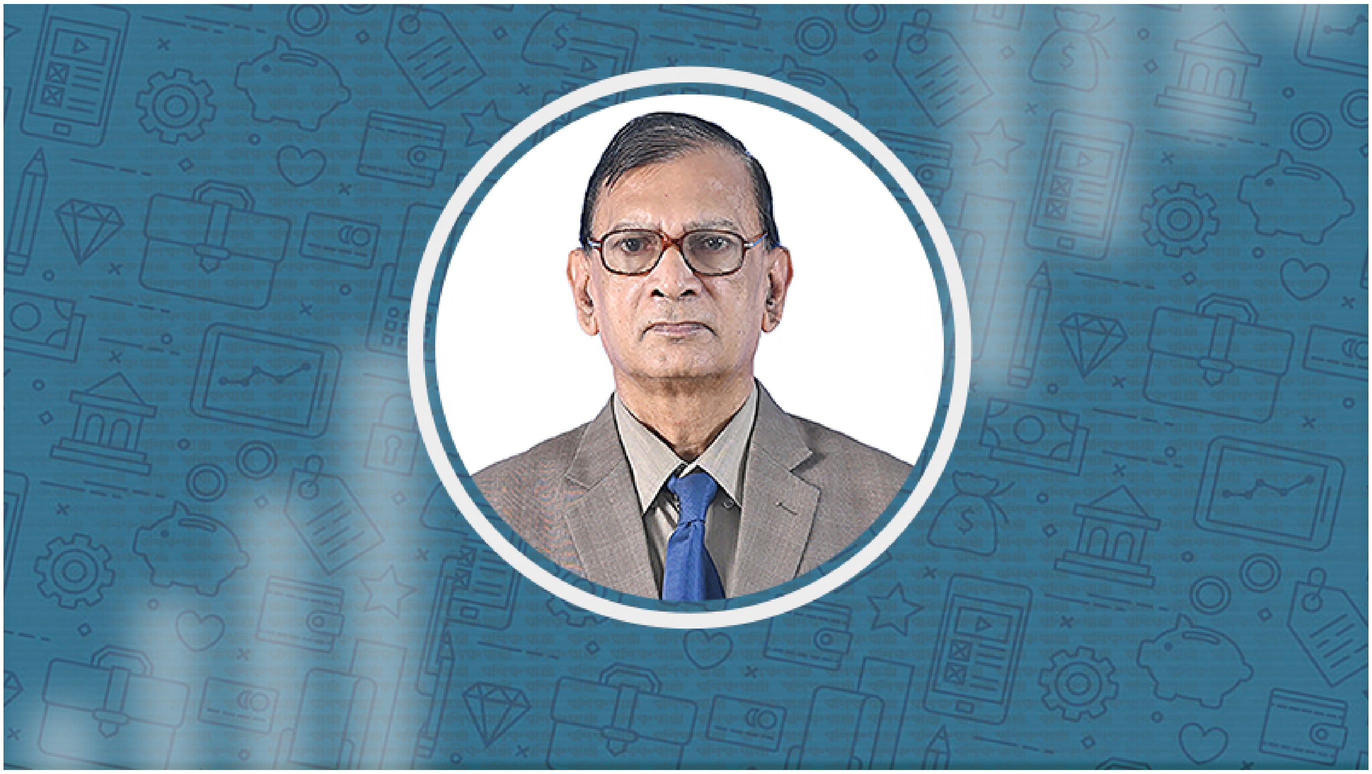

সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনীতির পর্যালোচনায় ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের হার নিয়ে খুব আলোচনা হয়, যা এর আগে তেমনটি দেখা যায়নি।গত ১ জুন মহান জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে, যেখানে মূল্যস্ফীতির হার ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছিল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ২২ শতাংশ। অথচ বাজার বলছে, দ্রব্যমূল্যের যে পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে তাতে মূল্যস্ফীতি এখন ১২ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে গত এক বছরের মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী এবং ১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি হয়েছে গত মে মাসে (৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ)। একই মাসে গত বছরে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। আগস্টে খাদ্যপণ্য মূল্যবৃদ্ধির রেকর্ড গড়েছে।চাল, ডাল, তেল, লবণ, মাছ, মাংস, সবজি, মসলা ও তামাক জাতীয় পণ্যের দাম বাড়ায় খাদ্যে মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে। ২০২০ সালে খাদ্য খাতে ১০০ টাকার পণ্যে ... ষ্ট বেড়েছে ১২ টাকা ৫৪ পয়স... মানুষ।গত ১৫

(https://electromart.com.bd)

বছরে ক্ষুধা জয়ের ক্ষেত্রে অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। মানুষের জীবনমান নিঃসন্দেহে বেড়েছে।তবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতির যে ভয়াল দৈত্য দেশের মানুষের ওপর চেপে বসেছে তাতে ক্ষুধার জ্বালা না বাড়লেও জীবনমান কমছে। খাদ্যপণ্যের পেছনে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে অন্যান্য খাতের চাহিদা অপূরণ থাকছে।এমনকি চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কৃচ্ছ্রসাধন চলছে।এ সংকটের সমাধান মূল্যস্ফীতিতে লাগাম টানা।সরকারের সুনামও এর সঙ্গে জড়িত।শহর ও গ্রামের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, গ্রামে এর ধকল বেশি।গ্রামাঞ্চলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।অন্যদিকে শহরের সার্বিক মূল্যস্ফীতি হচ্ছে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এটা হচ্ছে আমাদের সার্বিক মূল্যস্ফীতির চিত্র। অন্যদিকে প্রান্তিক আয়ের মানুষের কথা চিন্তা করলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সবার আগে আমলে নিতে হয়।

সরকার যে মূল্যস্ফীতির উপাত্ত প্রকাশ করেছে প্রকৃত চিত্র তা হলেও কিন্তু প্রান্তিক আয়ের মানুষের জন্য তা ভয়ানক। মূল্যস্ফীতির হার মাঝেমধ্যে একটু কমতেই পারে। কিন্তু এর পুঞ্জীভূত বিরূপ প্রভাব সর্বদা বহমান।গড় দাম কিংবা দামস্তর একবার বাড়লে তা তো নেমে আসবে না যদি না মূল্যস্ফীতি ঋণাত্মক হয়। আনুপাতিক হারে আয় না বাড়লে ভোগের ওপর এর বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান থাকবেই।আর উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলতে থাকলে জীবনযাপন কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, এটাই স্বাভাবিক।মূল্যস্ফীতির যে চাপ তা সবার ওপরই পড়ে এবং সেটা বুঝতে কোনো বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।কোনো দেশে যখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি থাকে তা সবাইকে প্রভাবিত করে।তার পরও উচ্চ ও মধ্যম আয়ের মানুষ চাপ থাকলেও মানিয়ে নেয়। কিন্তু যারা নিম্ন আয়ের মানুষ এমনিতেই তাদের নুন আনতে পানতা ফুরায়, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির মানে হলো সামগ্রিকভাবে অতিরিক্ত চাপ।জীবনধারণের জন্য যে ন্যূনতম ভোগ প্রয়োজন তাদের জন্য তা ধরে রাখা কঠিন। মূল্যস্ফীতি সহসাই যে নেমে আসবে সে রকম আশাব্যঞ্জক কিছু সামনে দেখছি না।

অনেকেই মুদ্রাস্ফীতির কারণকে অনেকভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি; দেশজ উৎপাদনে ঘাটতি; পণ্য সরবরাহে ঘাটতি; মুদ্রার বিনিময় হার; শুল্ক ও বিশেষ শুল্কহার; মুদ্রা সরবরাহ; বাণিজ্য ঘাটতি; বাজেট ঘাটতি; বিদেশের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতা; সুদের হার; ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণ; পণ্যের একচেটিয়া মূল্য নির্ধারণ; শ্রমিক ইউনিয়নের মজুরি বাড়ানোর চাপ; শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর মধ্যে খাতওয়ারি মজুরি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা; মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতিতে অসামঞ্জস্য; সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার মতো কারণগুলো।মূল্যস্ফীতির কারণ যেমন একটি নয়, তেমনি এর প্রতিকারও একটি সূচকের তারতম্য করার মাধ্যমে সম্ভব নয়।অর্থনীতিবিদদের মতে, বাজারে পণ্যের মজুদ ও মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাংক যখন অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপে, তখন মূল্যস্ফীতি ঘটে।

(https://electromart.com.bd)

মূল্যস্ফীতির হার যদি দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেটি সঠিক হয় না, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে দেশে জিডিপির চেয়ে মূল্যস্ফীতির হারের প্রবণতা বেশি। এ অবস্থায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে ধরা হয়েছে, যা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের মধ্যে। সম্প্রতি বিআইডিএসের গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকা শহরে গরিব মানুষের অর্ধেকের বেশি 'নতুন দরিদ্র'। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সপ্তম ধাপের (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) ফলাফল অনুযায়ী, এ মুহূর্তে বাংলাদেশী খানাগুলোর প্রায় অর্ধেকই খাদ্যের উচ্চমূল্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। জরিপে দেখা যায়, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে সবচেয়ে বড় আর্থিক ধাক্কা হিসেবে চিহ্নিত করেছে ৪৮ শতাংশ খানা। এই যে মূল্যস্ফীতি, তা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করছে। মূল্যস্ফীতি মধ্যবিত্তকে নামাচ্ছে নিম্ন-মধ্যবিত্তে, আর নিম্ন-মধ্যবিত্তকে নিয়ে যাচ্ছে নিম্নবিত্তে। এতে স্থানীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

অতিসম্প্রতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর '২৩) প্রথমার্ধের জন্য গত ১৮ জুন ২০২৩ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঘোষিত মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ সামগ্রিক বাজার অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার মাধ্যমে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সময়োপযোগী ও দিকনির্দেশনামূলক। ঘোষিত মুদ্রানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রেপো হার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে। এতে এ হার ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ, সেই সঙ্গে রিভার্স রেপো হার ২৫ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪ দশমিক ২৫ থেকে ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়েছে; মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে এবার সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে; নীতি সুদহার বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদহার সীমাও তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, সুদহার সীমার বদলে প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারভিত্তিক সুদহার কার্যকর হবে, যদিও তার মার্জিন থাকবে, টাকার সরবরাহ কমিয়ে এনে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাটাই উদ্দেশ্য। তা-ই যদি হয় তবে মূল্যস্ফীতির প্রভাবটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র জনগণকে কীভাবে প্রভাবিত করছে কিংবা এ সমাজের মানুষ কী অবস্থায় আছে তার একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সময়ের দাবি। অর্থনীতিবিদরা এ শ্রেণীকে পরিমাপ করেন আয়-ব্যয়ের নিরিখে, যা একইভাবে চিহ্নিত করাও হয় না। পিপিআরসি নিম্ন-মধ্যবিত্তকে চিহ্নিত করেছে তাদেরকে যাদের আয় মাসে ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হোমিও খোরাসের মতে, এ শ্রেণীর জীবনে গুণমান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও আত্মনির্ভরশীলতা থাকে। নানা পেশা থেকে তাদের আবির্ভাব হয় যারা নতুন নতুন পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা তৈরি করে। এ শ্রেণী শুধু আবশ্যক পণ্যই কেনে না, তারা শৌখিন পণ্যও ক্রয় করে। এটিই তাদের অর্থনৈতিক চরিত্র। ()

স্থানীয় অর্থনীতি এখন এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে যেখানে ছোট দোকান ও কৃষিজমির মালিক কিংবা শিল্প … ঘরে তাদের পর্যাপ্ত খাবার … অন্যান্য অনেক

(https://electromart.com.bd)

কেনাকাটা সেকেন্ডহ্যান্ড বা অনানুষ্ঠানিক অথবা খোলা বাজার থেকে কেনাকাটা করে। কিন্তু এ গোষ্ঠীর উত্তরণের স্বপ্ন খেয়ে ফেলছে মূল্যস্ফীতি। বরং তাদের অবস্থা আরো নাজুক হচ্ছে। আয়ের এখন পুরোটাই তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য কিনতে খরচ করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে যারা মধ্যবিত্ত পর্যায়ে ছিল, তারাও পড়তির দিকে। তাদের অনেকেই আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে না পেরে দরিদ্রের খাতায় নাম লেখাচ্ছে। স্থানীয় পণ্যের উচ্চমূল্য এবং মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা এটি মনে রাখতে হবে যে মূল্যস্ফীতির চাপ আরো কিছু সময় থাকবে। এটি সারা পৃথিবীতেই অনুভূত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে দুটি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়াতে হবে। এর জন্য দেশের ভেতরে উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানীকৃত পণ্যের সংগ্রহ বাড়াতে হবে; দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা দিতে হবে যাতে তারা বাজার থেকে পণ্য কিনতে পারে। তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিতে হবে, যাতে তাদের ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এ কার্যক্রমগুলোর জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, এর জোগান কে দেবে? তাই সরকারকে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। যেমন আমাদের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ খুবই কম যা বর্তমানে কর-জিডিপির হার মাত্র ৭ দশমিক ৭ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নিম্নতম। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন না বাড়ালে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে পারব না; তারপর বিষয়টি হলো সুশাসন অর্থাৎ সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে, অপ্রয়োজনীয় খরচ, প্রকল্প বাস্তবায়নে অপচয় রোধ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে, সরকার এরই মধ্যে ব্যয় কমানোর ব্যাপারে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলো ভালো উদ্যোগ। কিন্তু আরো সাশ্রয়ের সুযোগ রয়েছে; আরেকটি বিষয় হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেহেতু আমদানি ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং রফতানি আয় সে তুলনায় বাড়ছে না, রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়ছে না, চলতি হিসাবে বিরাট ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। এটি চলতে থাকলে তা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে চাপ সৃষ্টি করবে। এতে টাকার মান আরো কমবে এবং মূল্যস্ফীতিও বাড়বে। সুতরাং মূল্যস্ফীতি কমানোর বিষয়টি অনেক পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত। এটি পূর্ণাঙ্গ নীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সেটি করতে হবে। কেননা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির চাপ অব্যাহত থাকলে তা সমাজে আরো বৈষম্য বাড়াবে, যেটি মোটেই কাম্য নয়। আর স্থানীয় অর্থনীতি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ভোক্তা অধিকার সংস্থা, টিসিবি, পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনা, চাহিদা সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং সর্বোপরি আমদানি-রফতানি ব্যবস্থাপনায় কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা আনয়নপূর্বক এ সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে হবে। অধিকন্তু বিভিন্ন বাজার কমিটি দ্রব্যসামগ্রীর গুণাগুণ যাচাই কমিটি, মালামাল সংরক্ষণ ও গুদামজাত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি মহানগর ও পৌর এলাকার বাজারগুলোয় তাদের নিজস্ব পরিদর্শন টিমের আন্তরিকতার সঙ্গে তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ... দাম বাড়ায় সংসার খরচ ... ছনে। চাহিদার সঙ্গে দাম যা... কিছু বিশেষ

(https://electromart.com.bd)

ব্যবস্থাও নিয়ে থাকে। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এসব ব্যবস্থা বাজার নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবির মাধ্যমে খোলাবাজারে পণ্য বিপণন, বাজার মনিটরিং ইত্যাদি যেসব পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, এগুলো যেন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন রাখতে বিশেষ করে কৃষিপণ্যের সরবরাহে যাতে কোনো বাধার সৃষ্টি হতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে সংশ্লিষ্টদের।()

**ড. মিহির কুমার রায়:** অর্থনীতিবিদ

ডিন, ব্যবসা প্রশাসন অনুষদ, সিটি ইউনিভার্সিটি

# সম্পাদকীয়

অভিমত

## ডিগ্লোবালাইজেশনের দিকে ঝুঁকছে বৈশ্বিক অর্থনীতি?

**আহমেদ দীন রুমি**

সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৩

আগস্টের শেষ সপ্তাহে হয়ে গেল ব্রিকস সম্মেলন। উন্নয়নশীল দেশে কার্যক্রম বাড়ানো নিয়ে সিদ্ধান্ত হলো। পদক্ষেপ নেয়া হয় ডলারের আধিপত্য কমাতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহারের। সম্প্রতি শেষ হওয়া জি২০ ও আসিয়ানের সভায়ও আঞ্চলিক ব্যবসায় দেয়া হয়েছে গুরুত্ব। রাশিয়া তৎপর ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরাম নিয়ে। ফলে একদিকে স্থানীয়করণ ঘটছে বাণিজ্যের, অন্যদিকে পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞার জেরে পরিবর্তন আসছে সরবরাহ চেইনে। কিছু দেশ আবার গ্রহণ করেছে একলা চলার নীতি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—বিশ্বায়নের সূর্য কি তাহলে অস্ত যেতে চলল?

বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রধান প্রতিবন্ধকতা জলবায়ু ঝুঁকি, জ্বালানির পরিবর্তন, প্রযুক্তির পরিবর্তন, সাইবার নিরাপ ... জ্য নীতি এবং বৈশ্বিক সরবর ... এবং বাণিজ্যিক

(https://electromart.com.bd)

প্রতিষ্ঠানগুলো।কিন্তু নীতি, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সম্প্রতি প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিশ্বায়ন। অনেক সরকার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল নীতির দিকে ঝুঁকছে। তারা পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করতেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশ্বায়নের বিপরীত এ প্রবণতা পরিচিত ডিগ্লোবালাইজেশন নামে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় নতুন ভূরাজনৈতিক প্রবণতা এ ডিগ্লোবালাইজেশন

বা অবিশ্বায়ন।

ডিগ্লোবালাইজেশনের প্রধান চালক ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দা। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রতিক্রিয়ায় কিছু সরকার তখন নীতি পরিবর্তন করেছিল। সীমান্তজুড়ে আরোপ করেছিল বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা। বিশ্বব্যাপী মহামারী এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে দেড় দশক আগের সে রক্ষণশীল নীতিগুলোই।রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের জেরে ২৪টি দেশ রফতানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়াও আরোপ করেছে নিষেধাজ্ঞা।পাল্টাপাল্টি এ নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়েছে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে, যার ফল আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যস্ফীতির সূচকে দৃশ্যমান।

সরবরাহ চেইন ভেঙে পড়ায় সরকারগুলো তাদের বাণিজ্য কৌশল পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছে। বাড়ছে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সরবরাহ চেইন তৈরির প্রবণতা। অর্থাৎ অর্থনীতি ও বাণিজ্য স্থানীয়করণের ... দেশগুলো অনুসরণ করে ... ারের সামরিক সরকারের প্রতি ... ইউরোপীয়

(https://electromart.com.bd)

কোম্পানি।অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে ভোক্তাপণ্য খাতে সৃষ্ট সে শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে এশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো।বন্দর ও জ্বালানি ব্যবসায় একচেটিয়াভাবে প্রতিষ্ঠা করছে আধিপত্য। মিয়ানমারের সঙ্গে চীন, থাইল্যান্ড ও জাপানের মতো দেশগুলোর সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকার কারণে বেড়েছে এসব দেশের বাণিজ্যিক তৎপরতা।২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নেয়ার পর থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত মিয়ানমার ৫৪০ কোটি ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে চীন ও হংকংয়ের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০০ কোটি ডলার, যা মোট বিনিয়োগের ৫৫ শতাংশ।

বহুমাত্রিক সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো বিশ্বায়ন নিয়ে বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালছে।আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকির উত্থান ব্যবসাগুলোকে মহামারী-পরবর্তী বিশ্বে নতুনভাবে তৈরি করছে। জলবায়ু সংকট, অর্থনীতি এবং মূল্যস্ফীতি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এ ঝুঁকির মধ্যেই পড়ে। ডিগ্লোবালাইজেশন নিয়ে বিতর্ক যে নেই, তা নয়। তার পরও সামনের বছরগুলোয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে গিয়ে দেশগুলোয় ডিগ্লোবালাইজেশনের প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।হয়তো ডিগ্লোবালাইজেশন এখনো পুরোপুরিভাবে বিশ্বায়নকে উৎখাত করেনি।তবে বিশ্বায়ন যে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে, সেটাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিছু দেশ বিশ্বায়ন থেকে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।তবে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ধারা যে অসম রয়ে গেছে, তা কারো কাছেই অস্পষ্ট নেই। দেশগুলোর মধ্যে বর্ধিত বৈষম্য সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জিডিপি, মূল্যস্ফীতির হার এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপের মতো অর্থনৈতিক সূচকগুলো নতুন নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে।

ডিগ্লোবালাইজেশন চিহ্নিতকারীর মধ্যে রয়েছে মুক্ত ও অবাধ বাণিজ্যের বাধা।সে বাধার দুটি রূপ হলো ট্যারিফ ও কোটা।এর মাধ্যমে সরবরাহ চেইনের ওপর নিয়ন্ত্রণ করা যায়, হচ্ছেও তাই। এক দশকে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইনে স্থানীয়করণ ঘটেছে।ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ নীতির কারণে বেড়েছে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা। প্রাসঙ্গিক হিসেবে ভারতের উদাহরণ সামনে আনা যায়। কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখেছে ভারত।২০২১-২২ সালের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে ভারতে।ইউরোপীয় ও মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে ৬ হাজার কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ৪০০ শতাংশ বেশি।অন্যদিকে গত বছর চীনের বিদেশী বিনিয়োগ নেমে এসেছে ২ হাজার কোটি ডলারে।অথচ দেশটিতে ২০১৮ সালেও বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১২ হাজার কোটি ডলার। ভারতের এ উল্লম্ফনে অন্য অনেক কারণের একটি চীন-মার্কিন ভূরাজনৈতিক টানাপড়েন। পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে ভারত, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনামে ব্যবসা স্থানান্তর করছে। একইভাবে ভারতের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের বড় মন্ত্র দেশটির সরবরাহ চেইনে স্থানীয়করণ নীতি। ()

(https://electromart.com.bd)

মহামারী ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। সরবরাহ চেইনে পরিবর্তন ঘটলেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার ঘটেনি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) ডাটা থেকে দেখা যায়, বছরের শুরুর দিকে উন্নত অর্থনীতিগুলোয় গড় সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে, যা প্রভাব ফেলেছে মূল্যস্ফীতির ওপর।

সরবরাহের গতি নিয়েও এখনো সব মহলে উদ্বেগ বিদ্যমান। নতুন ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় নির্মাতারা ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে কাঁচামাল আমদানি এক দশকের সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে এসেছে। এটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য শুভ নয়। চাহিদা কমার পাশাপাশি কমেছে ইনভেন্টরি। উৎপাদনকারীরা দুই বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে আসার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তবে বৃহত্তর চিত্রটি উদ্বেগজনক। ভূরাজনৈতিক শৃঙ্খলা আরো অনিশ্চিত। ক্রমে দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরির মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন একে অন্যের পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক আরোপ করেছে। আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার এবং আরো ব্যাপক বাণিজ্য চুক্তির দিকে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের অনেক শুল্ক বহাল রয়েছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন জলবায়ু ঝুঁকি এবং বাণিজ্যের মতো বৈশ্বিক বিষয়গুলোয় সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে, তবে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এখনো জটিল। আগামী বছরগুললোয় সে সম্পর্ক কীভাবে বিকশিত হবে, তা ডিগ্লোবালাইজেশনের প্রবণতার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। বাণিজ্যের চারপাশে অমীমাংসিত সমস্যাগুলো একটি অনিশ্চিত এবং অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে, যা বিশ্ববাজারের জন্য অনুকূল নয়।()

২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষুন্ন করেছে, এ অঞ্চলের বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং শক্তি প্রবাহকে ব্যাহত করেছে। এটি বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য বড় আঘাত। পাশাপাশি এটি বিশ্বায়ন থেকে পশ্চাদপসরণের দিকে পরিচালিত করেছে। দেশগুলো অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতা ও স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বেইজিং, ব্রাসেলস, মস্কো, রিয়াদ ও ওয়াশিংটন ডিসিতে জ্বালানি তেলের দাম এবং সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্তে জ্বালানি তেলসংশ্লিষ্ট ভূরাজনীতি বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ রাশিয়ার জ্বালানি খাতের ওপর উপর্যুপরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পাশাপাশি চীন মহামারী-পরবর্তী বিধিনিষেধ তুলে নেয়ায় আগামী বছরগুলোয় জ্বালানি তেলের চাহিদা বাড়বে, যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে পরবর্তী ভূরাজনৈতিক সমীকরণে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের মাধ্যমে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলো বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে প্রভাব ফেলে। জি৭-ভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাইস ক্যাপ (মূল্য বে ... রোপে গ্যাসের

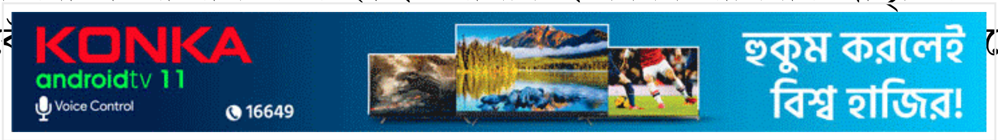

(https://electromart.com.bd)

দাম বেড়েছে। উচ্চমূল্য ২০২৩-২৪ সালের শীতকালজুড়ে থাকবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতি ব্যারেল ১১০ ডলারে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।২০২৫ সালের দিকে মূল্য কিছুটা কমতে পারে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন ইউরোপের বাইরের দেশগুলোকেও বাধ্য করেছে বৈশ্বিক ঝুঁকি নিয়ে ভাবতে। পারমাণবিক বিস্তার, সাইবার অপারেশন, অবকাঠামো স্থিতিস্থাপকতা এবং নিরাপত্তা জোটের ভবিষ্যৎ পুনর্বিবেচনা করতে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই বিশ্ব ডিগ্লোবালাইজেশনের পথে হাঁটছে। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকট অনেককেই গ্লোবালাইজেশনের সুবিধা নিয়ে সন্দিহান করে তোলে।কিছু সরকার রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করতে থাকে।এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের বিপরীতে হাঁটার প্রবণতা জোগান দিয়েছে।মহামারী তাতে পালন করেছে নিয়ামকের ভূমিকা।যদিও বিশ্ব এখন মূল্যস্ফীতির ক্ষত থেকে কাটিয়ে ওঠার পথে হাঁটছে।একই সময়ে ডিগ্লোবালাইজেশনের প্রবণতা এগিয়েই চলছে।

**আহমেদ দীন রুমি:** লেখক ও সংবাদকর্মী

অপেক্ষা করুন

(https://electromart.com.bd)